Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৫১তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই আষাঢ়, ১৪৩১ / 24.06.2024

:- সম্পাদক -:

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT C

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
৬৫-তে পার্থসারথি	শ্রী সুনন্দন ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
গীতায় শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীঅনিল বরণ রায়
স্বামী বিবেকানন্দের চোখে মা সারদা	শ্রী প্রণব ঘোষ
মহাভারতের উপাখ্যান	ভস্মলোচন
যেথা শিবের আলয় নর্মদাতীরে	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
অপ্রাকৃত	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, then converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720.

DO NOT COPY

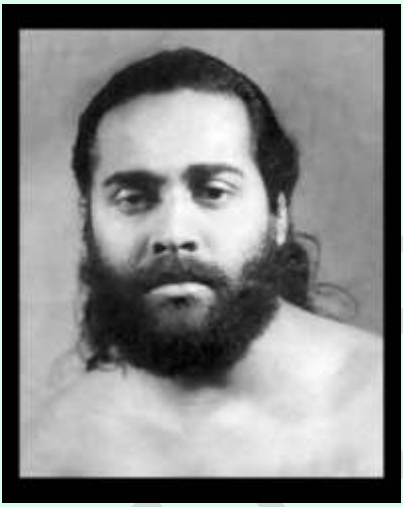

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"এই বিশ্বটাই ভগবানের কর্মলীলা। এই দিব্যকর্ম করতে হবে আত্মসংযম এর দ্বারা। আত্মসংযম মানে নিগ্রহ নয়। জোর করে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করলেই আত্মসংযম হয় না। মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে লাগিয়ে রেখে ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্ম করাই আসক্তি এবং আসক্তি বর্জন করে কর্ম করাই কর্মযোগের মূল কথা।"

DO NOT COPY

চিরকাল আমার বাবা আমাদের বলে এসেছেন, "আমি আছি তো !" কি যে গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগ ছিল একদিন, পালটে গেল পটটা! বোধহয় ১৯৮৬-র আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস - হাই ব্লাড সুগারের কারণে দুর্বলতা, সাথে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতায় বিচলিত ছিলেন বাবা, বললেন, "চোখে দেখছি না, পার্থসারথি বোধ হয় বন্ধ করে দিতে হবে..."। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, "কেনো? আমি আছি তো!"

কয়েক মাস পরে হঠাৎ চলে গেলেন বাবা, ২৪শে নভেম্বর বিকেলে। তার পরের দুপুরে কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশানে তাঁর শরীরটাকে বিদায় জানিয়ে বাড়ি ফেরার একটু পরেই মা একটা ট্যাক্সি করে শ্যামবাজার পোস্ট অফিস রওনা দিলেন অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩ সংখ্যার পার্থসারথির বাল্ক পোস্টিং এর জন্য। পরের মাসের বই কি আর বেরোবে নাকি এখানেই শেষ? মায়ের চাকরী, আমার চাকরী, সময়, দায়িত্ব, খরচ --- আলোচনা চলছিল একদিন। আমার বড়কাকু (শ্রী প্রণব ঘোষ) এসে যোগ দিলেন। পত্রিকা প্রকাশনায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁর যথেষ্ট অবদান। জানালেন – "কয়েকদিন আগে দাদা আমাকে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'মন্টু, আর চিন্তা নেই, বাবু বলেছে বাবু পার্থসারথির দায়িত্ব নেবে।'

আলোচনা শেষ।

নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজীগরে!

এ টি দেব-এর ডিকশনারি আর বাবার তত্ত্বাবধানে অল্প বয়স থেকেই প্রুফ দেখার সূচনা। বাড়িতে মাস্টারমশাই (শ্রী ভবতোষ রায়), স্কুলে নগেন বাবুর (শ্রী নগেন্দ্রনাথ ভৌমিক) প্রত্যক্ষ প্রভাব, দেওয়াল আলমারী ভর্তি গীতা চণ্ডী যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, রাজশেখর বসুর রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রতি সপ্তাহে দেশ অমৃত, বহু আশ্রম মিশনের পাঠানো সৌজন্য সংখ্যা, তার সাথে মায়ের বাংলায় এম এ-র পাঠ্যপুস্তকের ভাণ্ডার — বাধ্য হয়েছিলাম

সাহিত্যে ডুবে যেতে। স্কুল থেকে ফিরে একা থাকতাম যতক্ষণ মাস্টারমশাইরা না আসেন। পাড়ায় মেলামেশার নিষেধাজ্ঞা ছিল, মায়ের কলেজ থেকে ফিরতে সন্ধ্যে হত, বাবা বেরোতেন দেড়টা দু'টোয়, শ্যামবাজার থেকে ফিরতেন রাত নটা-দশটায়। বই ছিল আমার প্রধান সঙ্গী। চিবোতে না পারি গেলা চাই।

যা কল্পনাতেও ছিল না, আমার তো না-ই, পরিচিত কারোরই, দশ মিনিটে কার্ডিয়াক ফেলিওর-এর ধাক্কায় বাবাকে হারাবো। অনাকাঙ্ক্ষিত ফলশ্রুতি – পার্থসারথি ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক : সুনন্দন ঘোষ।

পত্রিকাকে জন্মলগ্ন থেকে বাবা পালন করেছেন সাড়ে ২৬ বছর। সময় এগিয়েছে। তাঁর অলক্ষ্য আশীর্বাদ নিয়ে পার্থসারথিও কোনো ছেদ না টেনে এগিয়ে গেছে অর্থনৈতিক, পারিবারিক, প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে দিয়ে। ২৪শে জুন, ২০২৪-এর ৫১ তম অন্তর্জাল সংখ্যার মাধ্যমে ঈশ্বরানুগৃহিত এই ছোট্ট পত্রিকা পা রাখলো ৬৫তম বছরে।

১৯৬০ থেকে ষাট বছর প্রতিমাসে ছাপানো বই, লক-ডাউনের সময় থেকে ই-বই – যুগের প্রয়োজনে রূপান্তরের ফল ৬৪ বছরের সফলতা।

পার্থসারথির জন্ম ও বিকাশ একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, কিন্তু শুরু থেকেই এর প্রচার ছিল দেশজুড়ে। মুদ্রিত মাসিক পত্রিকা ছড়িয়ে পড়তো ডাক বিভাগের মাধ্যমে প্রায় সব রাজ্যে, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে, মঠ আশ্রম, লাইব্রেরীতে। এই ধরণের যত ছোট পত্রিকার কথা আমি জানি, তাদের প্রত্যেকের শক্তির উৎস কোন মিশন, মন্দির, সঙ্ঘ বা রাজনৈতিক দল। প্রাতিষ্ঠানিক-দাক্ষিণ্য-ব্যতিরেকে একক প্রয়াসে ৬৪ বছর ধরে প্রচারিত পার্থসারথি সারা দেশে এক উজ্জ্বল ব্যাতিক্রম। তার পুঁজি সীমিত, কিন্তু প্রাণশক্তি অসীম।

DO NOT COPY

পাঠক-পাঠিকাদের অভীপ্সা, লেখকমণ্ডলীর ঐকান্তিকতা, শ্রীপ্রীতিকুমার-অনুরাগীদের নিষ্ঠা, সব কিছুর সমন্বয়ে সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এই ক্ষুদ্র পত্রিকার অগ্রগতি আজও অব্যাহত।

জয়তু শ্রীপ্রীতিকুমার! জয়তু পার্থসারথি!

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

লেখার শুরুতে একটা ব্যাপারে দুঃখ স্বীকার করে নিই। গত সংখ্যায় লিখেছিলাম প্রেসের থেকে টাকার জন্য তাগিদ দেবার কথা। পরে জানলাম সে তাগাদা পার্থসারথির জন্য নয়, সেটা সম্পাদক মশাইর Photographic Exhibition-এর লিফলেট ছাপানোর খরচ বাবদ। আমার সেটা জানা ছিল না। ..... যাইহোক পার্থসারথি আর এখন বাংলা মাসের প্রথমে বেরোয় না। ইংরাজী মাসের প্রথমেই প্রায় বেরোয়। তাই ঠিকমতো Salary পেলে আমাদের আর Payment-এর অসুবিধে হয় না। তবুও প্রেসের কর্তৃপক্ষের কাছে দুঃখ স্বীকার করেই নিচ্ছি।

ভাদ্র সংখ্যার পার্থসারথি ইংরাজী সেপ্টেম্বরের প্রথমে বেরিয়েছে। ঠিকমতো post করা সত্ত্বেও ডাক বিড়ম্বনায় আজ পর্যন্ত অনেকেই পান নি। সেজন্যও দুঃখ স্বীকার করছি পাঠকবর্গের কাছে।

এবার আবার NCC Camp করে এলাম। মনে হচ্ছিলো অনেক দূর চলে গেছিলাম। আসলে আমাদের camp-গুলি কলকাতায় হোক, আর কালিকটেই হোক, সব সমান। ঐ যে প্রথম দিন মেয়েদের নিয়ে ঢুকে পড়ি, আর শেষে বেরোবার দিন গাড়িতে উঠি। তাই দ্বীপান্তরের মতো মনে হয়। শ্রীপ্রীতিকুমারের কথা খুব মনে পড়ছিলো। এমন একটি camp ছিল না কাছাকাছি, যেখানে আমাকে দেখতে না

DO NOT COPY

গেছেন। এবার camp হয়েছিল Naval Coast Battery-তে। কি অপূর্ব সে জায়গা। Princep ঘাটে যে জাহাজগুলি যাতায়াত করতো, কি গম্ভীর বেগে তাদের আসা যাওয়া। ভটভটিগুলি এপার ওপার করছে। পাল তুলে নৌকাগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে। গভীর রাতে হলদিয়ার সেই লালচে আলোটা কি ভীষণ আকর্ষণ করত তা বলবার নয়। একা একা নিজেকে চেনবার চেষ্টা। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত। একবুক কান্না ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে। যা কিছু ভাল দেখি, যা কিছু ভাল পাই, সেই কি যেন আমার হারিয়ে গেছে! সেই যে একটা ছোট্ট মায়াভরা মুখ আমার ভিতরটাকে কেবলই বেদনাসিক্ত করে। সেখানে অলিখিত রক্তপাতের ঘটা। অথচ আমার নিজস্ব কিছু নেই। ঈশ্বর সব কেড়ে নিয়েছেন আমার কাছ থেকে। মনে হয় আরও কি পাপের বোঝা বইতে হবে আমায়?

শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে অনেক কথা বলতে চেয়েছিলান। আমি শুনতে চাই নি। তিনি চলে যাবেন আমি থাকব, তা কখনও ভাবিনি। সেই আমি পাঁচটা বছর কি কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটালাম ! মানসিক বল বেড়েছে সে কথা অনস্বীকার্য।

১৯৮৬ সালের ২৪শে নভেম্বর তিনি বিকাল ৪টা ৩০মিঃ নাগাদ চলে গেলেন। দুপুরবেলা মঞ্জুলাদির সামনে হঠাৎ বলে উঠলেন, "আমার ছেলের দ্বিতীয় বিবাহ কেউ আটকাতে পারবে না। দরকার হয় ও মুসলমান হয়ে যাবে।" সেই কথাটা কোনও ভাবেই তখন রসিকতা ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি।

অবশেষে আইনতঃ ছেলেটা মুক্ত হয়ে গেল। সব অপমান, আঘাত, অত্যাচারের অবসান ঘটলো। কিন্তু আমি যাদের জন্য ছটফট করে মরছি তারা কোথায় গেল? কি জানি ... হয়তো কংস বধের জন্য কৃষ্ণ গোকুলে বাড়ছেন। .....

ডায়মণ্ডহারবার জায়গাটা আমার খুবই চেনা। শ্রীপ্রীতিকুমার গাড়ি পেলেই চলে যেতেন দীঘা অথবা ডায়মণ্ডহারবার। পুরীতেও বছরে দুবার যেতেনই। সমুদ্র

DO NOT COPY

তাঁর ভীষণ পছন্দ ছিল। আমাদের মতো পাহাড়ে যেতেন না। আমাদের বর্ণনা শুনে এত উৎসাহিত হতেন, কারো কাছে আমাদের যাত্রা পথের বিবরণ দিতে গেলে মনে হত তিনিই পাহাড়ে ঘুরে এলেন।

বড়দিনের ছুটিতে দল বেঁধে আমরা পিকনিক করতে যেতাম। দরকার হলে দুটি গাড়ি ভর্ত্তি করে সবাইকে নিয়ে যেতেন। সেই প্রাণভরা হাসি যারা না দেখেছে তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। যদি কখনও আমি না যাই, জোড়া ইলিশ নিয়ে বাড়ি ঢোকা চাইই। শুধু তাই নয়, যাঁরা তাঁর সঙ্গে যেতেন ঐ রাত্রে তাদের মাছ কেটে ভেজে খাইয়ে দিতে হত। না হলে ভীষণ কষ্ট পেতেন। ওসব কাজ করে করে আমার অভ্যাস হয়ে গেছিলো।

শেষের দিকে কিশোরের একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল গলদা চিংড়ি নিয়ে আসা, তার মামার জন্য। ঐ রাত্রে কুটে পরিষ্কার করে, সে যাবার আগে রান্না করে খেতে দিতে হত। আমি দেখলাম ঐ অভ্যাসটা বাড়ছে।

কিশোরের মধ্যরাত ছাড়া আসা হয় না। একদিন রান্নাঘর থেকে সন্দেশ শুদ্ধ প্লেট শ্রীপ্রীতিকুমারের ঘরের সামনে 'বাউন্স' করাতে হল। সেকেণ্ডের মধ্যে কিশোর উধাও। একটু পরে শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে আসতে, খুব রসিকতা করে শুয়ে শুয়ে পা নাচিয়ে বললেন, "ছেলেটাকে ঐভাবে বিদায় করলে?" আমার তো জবাব দেবার ভাষা নেই। প্রায়ই যখন খাওয়া দাওয়ার পর শোবার ব্যবস্থা হচ্ছে, এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক স্কুটার চালিয়ে দেখা করতে আসতেন। আসলে আমাদের পারিবারিক ব্যাপার বলে কোনও বস্তু ছিলো না। সেই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। আমারও বয়স বাড়ছে, কর্মক্ষমতা কমে আসছে। Without notice-এ যখন তখন আসাটা আমিও পছন্দ করছি না। তাছাড়া তোমরা পৃথিবীর সব কাজ সেরে আসবে, আর আমি তোমায় আপ্যায়ন করবো তাতো হয় না। আমাকেও চাকরি করতে হয়। বাড়ীর সব কাজ সারতে হয়। তুমি যখন ছুটির দিন enjoy করবে, আত্মীয়ের বাড়ীতে যাবে, তখন আমার কথা মনে পড়বে না। আমি যখন বন্ধুর কাছে

যাবো বা ব্যক্তিগত কাজ করবো, তখন আমার খবর নিতে আসবে, তাতো হয় না! অগত্যা আগে অনুমতি নাও, তারপর আত্মীয়তা কর।

একথা ঠিক আমার পুত্তর মাঝে মাঝে অনেকের প্রতি দয়ালু হয়ে পড়েন। খরচ বা হ্যাপা তো তাকে পোয়াতে হয় না। তিনি সরকারি বড়ো সাহেব ! একটা র‍্যাশনের থলেতে করে ওয়াটারপ্রুফ, ফাইল ইত্যাদি পুরে হেলমেট হাতে নিয়ে তিনি অফিস যান। নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন করে রাত আটটা, সাড়ে আটটায় বাড়ি ফেরেন। (Motor cycle-এর Box ভেঙ্গে গেছে, তাই র‍্যাশনের থলি। Box-টা মা কিনে দিলে ভালো হয়।) এ বাড়ির নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে আমাকে একটু কঠোর হতে হয়। পুত্তর দয়ায় গলে যান। কাউকে কিছু না বললে ভালো হয়। তাঁকে তো আর দু-চার ঘন্টা বকর বকর করতে হয় না। তিনি তো তাঁর পছন্দের জায়গায় গিয়ে বকর বকর করেন। এবার ভাবছি এইসব My familiar- দের সেখানেই পাঠিয়ে দেবো।

শ্রীপ্রীতিকুমার এমন একটি ব্যক্তি ছিলেন যাঁকে আজ ঈশ্বরের প্রতিভূ বলতে কোনও অসুবিধে হয় না। সেই লোকটির অতি কাছে থেকেও আমি কত দূরের হয়েছিলাম। সময় পাইনি, সুযোগ পাইনি। হয়তো সেটা আমার উপকারই করেছে। তাই আজ আমার মনটা একমুখী হয়ে আছে। আজ আর আমার কাউকে ভয় নেই। শুধু একটি ভয় মনে পোষণ করি, যদি সেই কচিমুখ দুটি পাশ দিয়ে চলে যায়, চিনতে না পারে আমাকে ? তবু আমি আশা করে আছি একদিন আমার বাড়িটা ভরে যাবে। আমার অতি যত্নে তুলে রাখা খেলনা ও জিনিসগুলি তারা দু'হাত ভরে গ্রহণ করবে। আমার এ' প্রতীক্ষার শেষ কবে ? শবরীর প্রতীক্ষা কি এর চেয়েও কঠোর ছিল ? .....

- - - - - - - - (** রচনাকাল – সেপ্টেম্বর, ১৯৯১)

যে আসুরিক শক্তির উত্থান আজ আমরা দেখছি এমনটি এর পূর্বে জগতে বোধ হয় আর হয়নি। মিথ্যাই যেন সর্বত্র বিজয় লাভ করছে, মানবজাতির দুঃখের আর অবসান হচ্ছে না।

গীতায় দুই শ্রেণীর মনুষ্যের উল্লেখ আছে, দিব্য আর আসুরিক। ইহার অর্থ এই নয় যে সকল মনুষ্যকেই একান্তভাবে একটি কিংবা অপরটির শ্রেণীভুক্ত হতেই হবে। অধিকাংশ মনুষ্যই কোনও বিশিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। "সাধারণ মানুষ একটি মিশ্রণ মাত্র, তবে কোনও একটি গুণের উপর ঝোঁক বেশী থাকে, যার প্রভাবে প্রত্যেক মানুষই প্রধান ভাবে হয় রাজস-তামসিক অথবা সত্ত্ব-রাজসিক প্রকৃতির, এবং বলা যেতে পারে যে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই একটি কিংবা অপরটির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে - দিব্য আলোক কিংবা আসুরিক উগ্রতা।" বেশীর ভাগ লোক যদি আসুরিক প্রকৃতির দিকে যায়, বর্তমান যুগে তাই হচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে মানবজাতির ধ্বংস সুনিশ্চিত। গীতায় এই দুইটি প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমাদিকে বুঝতে হবে আসুরিক প্রকৃতি কী, এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে উহার থেকে দূরে থাকতে হবে।

আসুরিক মানবের জীবন্ত চিত্র গীতা অঙ্কিত করেছে। আসুরিক মানব জগৎকে আপনার অধীনস্থ করতে চায়, যার দৃষ্টান্ত আমরা দেখছি কম্যুনিষ্ট চায়নার বর্বরজনোচিত ভারত আক্রমণে। গীতার আসুরিক মানব বলে :-

" জগতে ভগবান নাই, এ জগৎ দিব্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কামনার বশীভূত হয়ে পরস্পরের মিলনের ফলে জগতের উৎপত্তি হয়েছে; আকস্মিক ভাবেই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে।"

গীতার মতে :- "জীবনকে ঐ ভাবে দেখে এবং মিথ্যার দ্বারা আত্মা ও যুক্তি বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে আসুরিক মানব হয়ে পড়ে ভয়ঙ্কর, দানবিক ও অত্যুগ্র কর্মের

কেন্দ্র বা যন্ত্র; এই জগতে তারা হয় ধ্বংসের শক্তি; মন্দ ও ক্ষতির উৎস স্থল। শত শত বন্ধনে তারা আবদ্ধ হয়, ক্রোধ এবং লালসার কবলিত হয়, অন্যায়-লব্ধ উপভোগ্য বিত্তসকল তারা স্তূপীকৃত করতে থাকে, নানাবিধ অহমিকাপূর্ণ ধারণায় পরিপূর্ণ হয়ে তাদের মন বিভ্রান্ত হয়; বাসনার পূর্তিতেই তাদের নেশা, তারা কর্ম করে, কিন্তু তা ভ্রমপূর্ণকর্ম; তারা পরাক্রমের সহিত কাজ করে, কিন্তু সে-সব কাজ তাদের নিজেদের জন্য; কামনার বশীভূত হয়ে, ভোগলালসায় তারা কাজ করে; অন্তর নিবাসী ভগবানের জন্য, জগৎরূপী ভগবানের জন্য তারা কোনও কাজ করে না। এইরূপে আসুরিক মানব আপন পাপের অপবিত্র নরকে নিমজ্জিত হয়।" (গীতা, ১৬/ ৮-১৬)।

গীতার অমর শিক্ষার বহুল প্রচারের দ্বারাই মানব জাতি "আপন পাপের অপবিত্র নরকে" নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এখন পর্যন্ত জানে না গীতায় কী অতুল ঐশ্বর্য আমাদের জন্য গুহ্য ভাবে রয়েছে; যদিও গীতাকে সমগ্র ভারতে এমন কি বিদেশেও উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। গীতার মধ্যে সেই নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে যার অনুসরণে স্বর্গরাজ্যকে পৃথিবীতে আনয়ন করা যায়, এবং মানব জাতি অজ্ঞানতা এবং দুঃখভোগ থেকে মুক্ত হয়ে ধরাতলে শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধশালী, প্রেম-আলো-সৌন্দর্যময় সুসঙ্গত দিব্য জীবন এবং অমর আনন্দ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। পৃথিবীস্থ মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই তাই; ভারতের আদিম ঋষিগণ ঐভাবেই জীবনকে দেখতেন এবং ঐরূপ জীবন উপলব্ধির জন্য দেবতাগণের সাহায্য ভিক্ষা করতেন।

পুনঃপ্রতিষ্ঠা

গীতায় কথিত হয়েছে যে বেদ এবং উপনিষদের গূঢ়তত্ত্ব কালপ্রবাহে বিনষ্ট হয়েছে, কালেন বহতা; গীতায় সেই তত্ত্বকে পুনরুজ্জীবিত করে তমসাচ্ছন্ন জগতে প্রচার করা হয়েছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "গীতাই বেদের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।"

যদিও গীতার যে কোন ব্যাখ্যা থেকে সকলেই কোন না কোন সাহায্য পেতে পারে, তথাপি গীতা থেকে পরিপূর্ণ সাহায্য লাভ করতে হলে একটি উত্তম ব্যাখ্যার অনুসরণ করা আবশ্যক। গীতার ব্যখ্যার কোন অভাব নাই, কিন্তু তাদের মধ্যে দুইটি মূল ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ সেই সমস্ত ব্যখ্যা দিয়েছেন বহু সহস্র বর্ষ পূর্বের আচার্যগণ। মানুষের মন ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন আধুনিক মানুষের পক্ষে সেই সব পুরাতন ব্যাখ্যার ভাষা, চিন্তা এবং ভাবধারা বোঝা কঠিন। বাংলার বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেখিয়েছেন কী ভাবে গীতার অমর শিক্ষাকে বর্তমান মানুষের চিন্তা ও ধারণার উপযুক্ত করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তিলক এদিকে আরও পূর্ণভাবে চেষ্টা করেছেন, এবং তাঁর গীতারহস্য বিশেষভাবে লোকপ্রিয় হয়েছিল। মূল মারাঠি থেকে আধুনিক প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় উহার অনুবাদ হয়েছে। যদিও ওঁদের পাণ্ডিত্য বিশাল, এবং যদিও তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা যোগী নন; এবং যাঁদের যোগসিদ্ধি নাই তাঁরা কখনই গীতাশিক্ষার মর্মোদ্ধার করে লোক সাধারণের কাছে উহার প্রকৃত ব্যখ্যা করতে সমর্থ হবেন না। সেই কারণেই শ্রীঅরবিন্দের ব্যখ্যা আমাদের কাছে এত আলোকপ্রদ এবং উপযোগী।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্যের দ্বারা একদিকে যেমন পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন অন্যদিকে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী যোগসাধনা তাঁকে সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধিদান করেছে যাহার দ্বারা তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এবং সংস্কৃতির এমন ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন যা পূর্বে কখনও হয়নি। তাঁর জগৎ প্রসিদ্ধ Essays on the Gita সম্বন্ধে The Statesman of Calcutta লিখেছেন:- "অরবিন্দ ঘোষের এই বইখানি সহজ সুন্দর ইংরাজীতে লেখা, ইহা হিন্দু ভাবধারাকে পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত করার দুরূহ কাজটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছে।" শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অনুযায়ী লিখিত গীতার বহু আলোচনা পুস্তকাকারে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় বহুল সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং লাখ লাখ সংখ্যা ইতিমধ্যেই বিক্রীত হয়েছে। পুরাতন আধ্যাত্মিক ধর্মপুস্তক সমূহে এমন সব তথ্য

আছে যা অধুনা আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের বিপরীত, সুতরাং তাদের প্রামাণিকতা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং ঐ সমস্ত প্রাচীন পুস্তক বোঝাবার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Essays on the Gita-র প্রথম অধ্যায়েই ঐ সমস্যার সমাধান করেছেন, "সত্য যদিও এক এবং সনাতন, তথাপি উহাকে কালের উপযুক্ত হয়ে এবং মানুষের মনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হতে হয়; সুতরাং প্রত্যেক আধ্যাত্মিক পুস্তকেরই দুইটি উপাদান থাকা অত্যাবশ্যক; একটি সাময়িক ও নশ্বর, যে দেশে এবং যে যুগে ঐ পুস্তক প্রকাশিত তাহারই ভাবধারার আয়ত্তাধীন অন্যটি চিরন্তন এবং অবিনশ্বর যা সর্বকালে এবং সর্বদেশে প্রযোজ্য। যে সত্যটি বুদ্ধির অতীত দৃষ্টিশক্তি দ্বারা লব্ধ, দৃষ্ট এবং অনুভূত হয় তাহাই সর্বতোভাবে চিরন্তন এবং বিশ্বজনীন হতে পারে।"

শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা প্রমাণ করেছে, "গীতায় এমন সত্য খুব সামান্যই আছে যা একবারেই স্থানীয় বা সাময়িক, এবং ইহার সত্য এতই বিশাল, গভীর এবং বিশ্বজনীন যে ঐ সামান্যটুকুকেও সহজেই সার্বজনীন এবং সর্বকালীন করে নেওয়া যায়, এবং তাতে গীতার শিক্ষার কোনও বিকৃতি বা বিচ্যুতি তো হবেই না, বরঞ্চ গীতাকে স্থান ও কালের অতীত করে ইহার সত্যকে অধিকতর গভীর এবং শক্তিসম্পন্ন করা হবে।" যজ্ঞের অগ্নি থেকে মেঘ জন্মে একথা কেউ স্বীকার করবেন না। পুরাকালে নিশ্চয়ই এমন লোক ছিলেন যাঁরা বৃষ্টিলাভের জন্য যজ্ঞ করতেন। কিন্তু বেদে যজ্ঞ শব্দটিকে প্রতীক স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে গভীর মনস্তাত্ত্বিক সত্য প্রকাশের জন্য। যে অগ্নির স্তবগান বৈদিক ঋষিরা করতেন তাহা আমাদের অন্তরের আস্পৃহা বহ্নি, বাহ্যিক অগ্নি নয়। বেদে ব্যবহৃত শব্দসমূহ সেই অর্থই প্রকাশ করে। অগ্নিকে প্রচেৎ অর্থাৎ "সচেতন ও চিন্তাশীল" বলা হয়েছে। অগ্নির কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, "আমাদিকে সেই শান্তি দাও যা দূর থেকে শুনতে পায়, শম দীর্ঘশ্রুত। গীতায় যজ্ঞ কর্মের ব্যাখ্যা ঐরূপভাবেই করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "আদিম ভারতীয় পদ্ধতিতে যজ্ঞের অর্থ ছিল দেবতা এবং মানবের মধ্যে একটি আদান প্রদান। ঐ পদ্ধতি এবং ধারণা বহুদিন থেকে ভারতেই প্রায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে,

এবং সাধারণ মনের কাছে উহা আর সত্য নয়। কিন্তু এই যজ্ঞ শব্দটির দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে তা সমগ্রভাবেই সূক্ষ্ম, রূপক এবং প্রতীক স্বরূপ, এবং দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণাও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বগ্রাহী এবং দার্শনিক সত্যপূর্ণ। তাই আমরা উভয়কেই মনস্তাত্ত্বিক সত্য এবং প্রাকৃতিক সাধারণ বিধানের প্রকাশ রূপে মেনে নিতে পারি, এবং ঐ সত্যটিকে আমাদের বর্তমানের আদান প্রদানের রীতিতে নিয়োগ করতে পারি, যাতে জীবজগতে যে আদান প্রদান, নৈতিক উৎসর্গ এবং আত্মদান চলেছে তাহার এক উদার, গভীরতর অর্থ করা যায়, এবং উহাদের উপর দূরস্পর্শী, আধ্যাত্মিক আলোক নিক্ষেপ করা হয়।"

অনুশীলন

বর্তমান যুগে এমন সব লোক আছেন যারা গীতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন মহাড়ম্বরের সহিত যজ্ঞ এবং হবন করে। তারা গীতার আন্তরিক সত্যটিকেই ধরতে পারেন নি। গীতা একটি যোগশাস্ত্র, গীতায় আভ্যন্তরিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিধানই দেওয়া হয়েছে যাঁহার সাহায্যে আমরা আমাদের অন্তরের আত্মাকে আবিষ্কার করে আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, এষা ব্রাহ্মী স্থিত। প্রকৃতপক্ষে এখন ধর্ম হয়ে পড়েছে বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র, আধুনিক ধর্মসমূহে আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ বড়ই ক্ষীণ, সেই হেতু ধর্মের মধ্যে এসেছে এত ভ্রষ্টতা, এত দুঃখ-বেদনা। গীতার আধ্যাত্মিকতার বহুল প্রচারের দ্বারাই এই শোকাবহ পরিস্থিতির অবসান হতে পারে।

গীতার অধুনা প্রচলিত ব্যাখ্যা সমূহে আরও বৃহৎ ত্রুটি আছে। আধ্যাত্মিকতা এবং যোগ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারীগণের নিজস্ব সাম্প্রদায়িক মতবাদ আছে; তাঁরা গীতার সরলার্থক শ্লোকগুলিকে এমনভাবে বিকৃত করেন যাতে তাঁদের সাম্প্রদায়িক মতবাদের সমর্থন গীতায় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দকে নিযুক্ত করেন গীতার প্রকৃত অর্থ আধুনিক জগতকে দান করে সনাতন ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। আলিপুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করার পর উত্তর পাড়ায় তিনি যে প্রসিদ্ধ অভিভাষণ দেন তাহাতে তিনি তাঁহার জেলের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন :-

"তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) পুনরায় আমায় বললেন, 'সে-বন্ধন ছিন্ন করার ক্ষমতা তোমার ছিল না, আমি তোমার সেই বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছি। কারণ আমার অভিপ্রায় নয়, কোনও দিনই ছিল না, যে তুমি ঐ বন্ধন দশায় থাক। তোমার করণীয় অন্য কর্ম আছে, এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে এখানে এনেছি; তুমি নিজে যা শিখতে পারনি তাই তোমায় শিখাব, এবং আমার কাজের জন্য তোমায় গড়ে তুলবো।' এই কথা বলে তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন, তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হোল, এবং আমি গীতার সাধনা করতে সক্ষম হলাম। শুধু যে বুদ্ধির সাহায্যে গীতা বুঝলাম তাই নয়, উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে যা প্রত্যাশা করেছিলেন তারই উপলব্ধি আমার হোল। যারা তাঁর কাজ করার আস্পৃহা রাখে তাদের কী করা কর্তব্য তাও বুঝলাম। রাগ-দ্বেষ মুক্ত হতে হবে, ফলের দাবী না করে তাঁর কাজ করে যেতে হবে, নিজস্ব ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তাঁর হাতে সমর্পিত বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চ ও নিম্নে, শত্রু এবং মিত্রে, জয় ও পরাজয়ে সমভাব রেখে অবহেলা না করে তাঁর কাজ করে যেতে হবে। আমি বুঝলাম হিন্দু ধর্মের স্বরূপ। আমরা প্রায়ই হিন্দু ধর্মের, সনাতন ধর্মের উল্লেখ করি, কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই এই ধর্মের স্বরূপ জানেন। অন্যান্য ধর্ম প্রধানতঃ বিশ্বাস এবং বিধানানুবর্তিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সনাতন ধর্ম হোল মানবের জীবন, এই ধর্মে সত্যকে মেনে নেওয়ার উপর তত জোর দেওয়া হয় না, সত্যের মধ্যে বাস করাই এই ধর্মের স্বরূপ। মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য আদিম কাল থেকে এই উপদ্বীপের নিরালায় সনাতন ধর্ম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। এই ধর্মকে প্রচারিত করবার উদ্দেশ্যেই ভারতের উত্থান। অন্যান্য দেশ যেমন নিজের জন্যই, এবং দুর্বলকে পদদলিত করবার জন্য উন্নত হয়, ভারত সে-ভাবে উত্থিত হচ্ছে না। যে চিরন্তন আলো ভারতের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে তা জগতে বিচ্ছুরিত করবার জন্য ভারত জননী উত্থিত হচ্ছেন। ভারতের অস্তিত্ব আপনার জন্য নয়, মানব জাতির জন্য। ভারত মহান হবে নিজের জন্য নয়, মানবজাতির জন্য।"

বর্তমানের এই সমূহ বিপজ্জনক সঙ্কটাবস্থায় চায়না যখন তার পাশবিক রীতি অবলম্বন করে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে এবং হিমালয়ের উপরে সময়োপযোগী সব স্থানগুলি অধিকার করে নিয়ে বসে আছে, এখন আমাদের প্রধান নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ এই ধর্ম নীতি প্রচার করছেন যে চায়নার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া ভারতের উচিৎ নয়, কারণ যুদ্ধ ব্যাপারটাই পাপ এবং উহা ভারতের মজ্জাগত আধ্যাত্মিকতার বিরোধী, ভারতের আধ্যাত্মিকতা শান্তি এবং অহিংসারই সমর্থনকারী।

ঐরূপ মতবাদ ভারতের আধ্যাত্মিকতার কদর্য এবং ভ্রান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা। ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়েরা মানবতার সর্বোচ্চ নিদর্শন ছিলেন, এবং যুদ্ধই ছিল তাঁদের পবিত্র কর্তব্য। ধর্মযুদ্ধ করা অপেক্ষা মহত্তর শুভকর্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না। (গীতা, ২/৩১)।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Essays on the Gita-তে বলেছেন,

"এই জগৎ, বাস্তব স্তরে আত্মার এই যে প্রকাশ, ইহা শুধু আন্তরিক ক্রমোন্নতির ক্ষেত্র নয়, বস্তুতঃ ইহা একটি ক্ষেত্র যেথায় জীবনের বাহ্যিক ঘটনাগুলিকে গ্রহণ করতে হয় আন্তরিক উন্নতির সুযোগ এবং সাহায্যদায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থা রূপে। ইহা পরস্পরকে সাহায্য করার জগৎ এবং বিগ্রহের ভূমি, শান্তিতে সমাহিত হয়ে অনাবিল আনন্দ স্রোতে ভাসতে ভাসতে অগ্রসর হতে দেয় না এই জগৎ, হেথায় প্রতিটি অগ্রগামী পদক্ষেপের জন্য বীরের ন্যায় প্রচেষ্টা করতে হয়, বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘাতে জড়িত হতে হয়। যারা আন্তরিক এবং বাহ্যিক যুদ্ধ-বিগ্রহকে স্বীকার করে, এবং সমর রূপ অতি বাস্তব সংঘর্ষণকেও গ্রহণ করে তারাই ক্ষত্রিয়, তারাই নরবীর। যুদ্ধ, তেজ, মহানুভবতা, শৌর্য হোল ক্ষাত্র চরিত্রের গুণ। ন্যায়ের সংরক্ষণ করা, অসঙ্কোচে বিনা দ্বিধায় যুদ্ধের সন্মুখীন হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং অবশ্য কর্তব্য। কারণ সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়, রক্ষাকারী শক্তি এবং ধ্বংসকারী অত্যাচারীর শক্তির মধ্যে নিয়ত সংঘাত চলেছে; এই সংঘাত যখন বাস্তব জগতে যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে তখন সত্যের সেবক এবং পতাকাবাহী তার কর্তব্যের উগ্র এবং ভয়ঙ্কর

DO NOT COPY

রূপ দেখে কখনই কম্পমান বা অবশ হবে না; সে তার সঙ্গী সহযোদ্ধাদের কদাপি পরিত্যাগ করবে না; কর্তব্যচ্যুত হয়ে সত্য ও ন্যায়ের ধ্বজাকে কখনই ধূলায় লুণ্ঠিত হতে এবং আততায়ীর রুধির-রঞ্জিত পদের দ্বারা কর্দমে দলিত হতে দেবে না, উগ্র এবং নির্দয় শত্রুর উপর সে কখনই দুর্বলতা প্রসুত কৃপা প্রদর্শন করবে না; বিধি নির্দিষ্ট ধ্বংসের বিশালতা এবং ভয়ঙ্করতায় সে কখনই কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হবে না। তাহার ধর্ম এবং তাহার কর্তব্য যুদ্ধ করা, যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়া নয়। ধর্মযুদ্ধে হত্যা না করাই পাপ, হত্যা করা পাপ নয়।"

স্বামী বিবেকানন্দের চোখে মা সারদা **শ্রী প্রণব ঘোষ**

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের কথা সর্বজন বিদিত। ঠাকুরের পুণ্য স্পর্শেই নরেন্দ্রের বিবেকানন্দে রূপান্তর। তিনি স্বামীজীর মধ্যে তাঁর সকল শক্তি নিঃশেষে সঞ্চার করে দিয়ে 'ফকির' হয়েছিলেন। ঠাকুরের শক্তিই স্বামীজীর বিচিত্র ও বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে প্রকাশ লাভ করেছিল। স্বামীজী নিজেও কোন সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দাবী করেন নি, অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন, If there has been anything achieved by me, by thoughts, or words or deeds, if from my lips has ever fallen any word that has helped anyone in the world, I lay no claim to it, it was his."

কিন্তু স্বামীজীর চোখে মায়ের স্থানও ছিল খুব উচ্চে। মা সারদা ছিলেন মূর্তিমতী আদ্যাশক্তি। ঠাকুর তা জানতেন এবং মাকে স্বয়ং জগদম্বারূপে পূজাও করেছিলেন। মায়ের স্বরূপ ঠাকুরের সন্তানদের কাছে অবিদিত ছিলনা, তবে মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম মায়ের দিব্য স্বরূপ উপলব্ধি করেন। কোন এক গুরুভাইকে স্বামীজী একবার লিখেছিলেন, "মা ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের

দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন ? - শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ, শক্তির কৃপা না হলে কি ছাই হবে? ... আমার চোখ খুলে যাচ্ছে। দিন দিন সব বুঝতে পারছি।"

একবার সুরেন্দ্রনাথ সেন দীক্ষার্থী হয়ে স্বামীজীর কাছে যান। স্বামীজী তাঁকে বললেন, "তোকে যিনি দীক্ষা দেবেন তিনি আমার চেয়েও বড়। হতাশ হবার কারণ নেই, সময়ে সব হবে।" কিছুকাল পরে সুরেনবাবু স্বপ্নে দেখেন তিনি ঠাকুরের কোলে বসে আছেন এবং এক উজ্জ্বল দেবীমূর্তি সামনে এসে তাঁকে মন্ত্র দিতে চাইছেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'সরস্বতী' তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্বামীজীর কাছে প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন, "ঐ মন্ত্র জপ করতে থাক, পরে ঐ মন্ত্রদাত্রী মূর্তিকে সশরীরে দেখতে পাবি। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমান আবির্ভূতা, উপরে মহা শান্তভাব, ভিতরে সংহারমূর্তি। সরস্বতী শান্ত কিনা।" পরে তিনি জয়রামবাটী যান এবং মায়ের কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন। তখন দেখেন স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি ও মা এক ও অভিন্ন। বলা বাহুল্য স্বামীজীর ভবিষ্যৎ বাণী সফল হল এবং সেনমশাই উপলব্ধি করলেন স্বামীজী সঠিকভাবে মায়ের ঐশ্বরিক স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন।

মায়ের প্রতি স্বামীজীর ভক্তি বিশ্বাসের তুলনা নেই। স্বামী শিবানন্দের কাছে লেখা একখানা চিঠিতে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় - "যার তাঁকে বিশ্বাস নাই আর মা ঠাকুরাণীতে ভক্তি নাই তার ঘোড়ার ডিমও হবে না - সাদা বাংলা বললুম, মনে রেখো।" তিনি আবার বলেছেন, "দাদা, বিশ্বাস বড় ধন, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব তবে আমার নাম ...। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।" ঠাকুরের

প্রতি স্বামীজীর ভক্তি বিশ্বাসের গভীরতার কথা সকলের জানা আছে। মনে হয় মায়ের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই স্বামীজী সকল মহৎ কর্মে হাত দিতেন। আমেরিকার চিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্মসভায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের জন্যে মাদ্রাজের কিছু ভক্ত স্বামীজীকে অনুরোধ করেন। ভারতের বাইরে হিন্দু ধর্মের শাশ্বত বাণী প্রচারের এই সুযোগ গ্রহণে স্বামীজীরও ইচ্ছা হয়, তবে যাওয়া উচিৎ কিনা তা স্থির না করতে পেরে ভাবলেন, "শ্রীমার কাছে একখানা চিঠি দিই, তিনি যদি বলেন, যাও, তবে বুঝবো আমার যাওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত।" মা তাঁকে সম্মতি ও আশীর্বাদ জানালে স্বামীজীর সকল দ্বিধা কেটে গেল। তিনি বললেন, "শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ পেয়েছি, সমস্ত সংশয় ভাবনা দূর হয়েছে, আমি আমেরিকা যাবার জন্য প্রস্তুত। করুণাময়ী জননী আশীর্বাদ করেছেন আর চিন্তা কি?"

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন মায়ের আশীর্বাদেই তিনি আমেরিকায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে মা যখন তাঁর প্রশংসা করছিলেন তখন স্বামীজী বলেন "এসব কি ছাইপাঁশ বলচ? এসব আমি করেচি, না তুমি করেচ? তুমি ইচ্ছামাত্র আমার মতো লাখো বিবেকানন্দ করতে পার তা' কি আমি জানি না?"

স্বামীজীর কাছে মা ছিলেন পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। স্বামীজীর ন্যায় শুদ্ধাত্মা মহাপুরুষ বিরল। তথাপি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে গঙ্গাজল পান করতেন যাতে দেহে মনে অশুচিতার লেশমাত্র না থাকে। একবার নৌকা করে হরি মহারাজের সঙ্গে মাকে দর্শন করতে যাচ্ছিলেন। নৌকায় বসেই ঘন ঘন গঙ্গাজল পান করছিলেন। তা দেখে হরি মহারাজ বলে উঠলেন, "ঘোলাজল বার বার খাচ্ছ, শেষকালে কি সর্দি করে বসবে?" স্বামীজী বললেন, "না ভাই , ভয় করে; আমাদের মন, মায়ের কাছে যাচ্ছি, ভয় করে।"

বাবুরাম মহারাজ একবার নীলকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ ভক্তদের বলেছিলেন, স্বামীজী যেদিন মাতৃদর্শনে যেতেন আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিতেন। একদিন ভোরে উঠে গঙ্গাস্নানে গেলেন। বারবার ডুব দিচ্ছেন যেন কিছুতেই পবিত্রতা আনতে পারছেন না। শেষকালে যদিও বা উঠলেন, সেবককে বললেন আমার গায়ে গঙ্গাজলের ছিটে দে। কোনরকমে মায়ের ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়েছেন, আর চলতে পারলেন না, ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ে গেলেন। মা তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে তুলে ধরলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

শ্রীশ্রীমার স্নেহঘন মাতৃমূর্তি দেখে স্বামীজী অবাক হয়ে যেতেন। মা যখন বোসপাড়ার বাড়ীতে ছিলেন তখন একদিন স্বামীজী এসে গোলাপ মাকে বললেন, গোলাপ মা, আমার বড় খিদে পেয়েছে। গোলাপ মা গোটা কতক মিছরির টুকরো নিয়ে স্বামীজীর হাতে দিলেন। স্বামীজী তো রেগে খুন। মা উপর থেকে সব শুনতে পাচ্ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি থালায় করে খাবার পাঠিয়ে দিলেন। স্বামীজী তখন বলতে লাগলেন, "একেই বলি মা। ঠাকুর আঙ্গুলে দেখিয়ে, এইটি আমার বাবুরাম খাবে, এইটি আমার ও খাবে, বলতেন। পুজুরু বামুনের মেয়ে মা কেমন করে এমন হল আমি বুঝতে পারছি না।"

মাঝে মাঝে স্বামীজী মায়ের কাছে এসে শিশুর মতো আচরণ করতেন। যেবার বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গা পূজা হল সেবার স্বামীজীর কি উৎসাহ, আনন্দ। মা মঠেই আছেন। মায়ের নামে পূজার সংকল্প হয়েছে, স্বামীজীর নির্দেশে ব্রহ্মচারীরা সব পাগলের মতো খাটছে। স্বামীজী জানতেন তিনি অনেক সময় অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পাছে রেগে গিয়ে ব্রহ্মচারীদের তিরস্কার করেন এবং তাদের আনন্দ মাটি হয়, তিনি বেলাশেষে মায়ের কাছে এসে বললেন, মা আমায় জ্বর করে দাও। বাস্তবিক মায়ের ইচ্ছায় স্বামীজীর তক্ষুনি জ্বর এসে গেল, তিনি কয়েক ঘণ্টা জ্বরে শুয়ে রইলেন। তারপর যখন উঠলেন তখন সুস্থ শরীর।

DO NOT COPY

স্বামীজীর কাছে মায়ের বাক্য ছিল শিরোধার্য। তিনি কখনই মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করতেন না। একবার একটি ভৃত্যকে স্বামীজী কোন কারণে বিদায় করে দিয়েছিলেন। তখন ভৃত্যটি মায়ের শরণাপন্ন হয়। তার কাতরতায় বিচলিত হয়ে মা তাকে রাখবার নির্দেশ দিয়ে ফেরত পাঠান। স্বামীজী তখন বলেন, "শালা গিয়ে হাইকোর্ট ধরেছে।" বাস্তবিক স্বামীজীর কাছে মায়ের আদেশ ছিল সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের রায়স্বরূপ। একবার স্বামীজী বেলুড় মঠে দুর্গাপূজায় ছাগ বলি দিতে ইচ্ছা করেন, উদ্দেশ্য ভীরু দুর্বল জাতির চিত্তে রজোগুণ সঞ্চার। কিন্তু মায়ের সম্মতি মিলল না। কোমল হৃদয় মায়ের পক্ষে রক্তপাতের ভয়ঙ্করতা সহ্য করা সম্ভব ছিল না, তাছাড়া তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন মঠের মধ্যে রাজসিক ভাবের পূজার্চনা অনুচিত। অন্য কেহ হলে শাস্ত্রের নজীর তুলে নিজের যুক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু মা স্বয়ং জগদম্বা; তাঁর আদেশ অবশ্য পালনীয়। স্বামীজী তাই দ্বিরুক্তি না করে নিজের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করলেন।

মায়ের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কেও স্বামীজী সর্বদা সচেতন ছিলেন। কি স্বদেশে, কি বিদেশে যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি সর্বদাই মায়ের খোঁজ নিতেন এবং মায়ের খরচ পত্র কেমন চলছে সে সম্পর্কেও সংবাদ নিতেন। চিঠিতে সে সম্পর্কে সংবাদ না থাকলে তিনি বিরক্ত হতেন। কোন এক গুরু ভাইকে একবার লিখেছিলেন "মা ঠাকুরাণীর খরচপত্র কেমন চলছে, তোমরা তো কিছুই লেখ নাই। খালি childish prattle." মায়ের একটি পাকাপাকি বাসস্থানের জন্যও তিনি রীতিমত উদ্বিগ্ন ছিলেন।

স্বামীজীর প্রতি মায়ের স্নেহ ভালবাসাও ছিল সুগভীর। শুধু তাই নয়, তাঁর সকল কর্মের প্রতি মায়ের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আশীর্বাদ ছিল। ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বক্তৃতায় স্বামীজী সে কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেছিলেন- "Who would sympathise with me? None expect one. That one's sympathy

brought blessing and hope. She was a woman.....we have all great respect for her."

স্বামীজী শেষদিকে একদিন মাকে প্রণাম করে বলেছিলেন - "মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভুত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো জানি, তোমার মতো মা জগতে এই একটিই, আর দ্বিতীয় নেই।"

মহাভারতের উপাখ্যান **ভস্মলোচন**

গরুড়ের জন্মবৃত্তান্ত

(১)

আমাদের জন্মান্তরবাদ-ভিত্তিক শাস্ত্রপুরাণে তথাকথিত 'ক্রমবিকাশবাদের' কোন স্থান নেই। তাই জীবসৃষ্টির আদিতেই তির্যগযোনির সৃষ্টি না হয়ে, পুরাণমতে দেব-দানব-মানব ও যক্ষ-রক্ষাদির সৃষ্টির পরেই তাদের জন্মের কথা শোনা যায়।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি দক্ষ তাঁর অনেকগুলো মেয়ের মধ্যে কদ্রু ও বিনতা নামে মেয়ে দুটির বিয়ে দিয়েছিলেন মহর্ষি কশ্যপের সাথে। এদের মধ্যে, কদ্রুর গর্ভ থেকে প্রথমে বেরিয়েছিল এক হাজার ছোট ছোট ডিম, আর বিনতার গর্ভ থেকেও অন্যরকমের দুটি বেশ বড় ডিমও। ক্রমে কদ্রুর সেই এক হাজার ডিম ফুটে বেরিয়ে এল হাজার খানেক সাপ। কিন্তু বিনতার ডিম দুটি আর ফোটে না! অবশেষে একদিন সে ধৈর্যহারা হয়ে একটি ডিম ভেঙ্গে ফেলতেই, তা থেকে বেরিয়ে পড়ল অর্ধপুষ্ট বিরাট পক্ষিশাবক একটি। বেরিয়ে এসেই মায়ের উপর কী রাগ বাচ্চাটির! মায়ের ব্যস্ততার জন্যই তো আজ তার এই অবস্থা। যাহোক, মায়ের কোল ছেড়ে উড়তে উড়তে সূর্যমন্ডলে পৌঁছে গিয়ে বহাল হল সে সূর্যের

DO NOT COPY

সারথির পদে। নাম হল তার অরুণ। তাই রথ নিয়ে সারথি অরুণের উদয় হলেই, বুঝতে হবে সূর্যোদয়ের ার দেরী নেই। উড়ে যাবার আগে কিন্তু বাচ্চাটি রাগে আগুন হয়ে মাকে শাপ দিয়ে গিয়েছিল - পঞ্চাশ বছর ধরে করতে হবে তাকে সতীন কদ্রুর দাসীপনা! ওদিকে সাপের মা কদ্রুও ছল খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কেমন করে বোন-সতীনকে জব্দ করা যায়। কাজেই হল এখন শনির সাথে রাহুর যোগ! তাছাড়া কথাও আছে - দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না! কেমন করে যে তা হয়নি, তাই-ই এবারের কথা!

(২)

একেবারে সেই আদিপর্বের ব্যাপার কিনা! কাজেই, একদিকে যখন ঘটছিল এইসব ঘটনা, অন্যদিকে তখন চলছিল দেবদানবে মিলে সমুদ্রমন্থন। একে একে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে, আগাগোড়া দুধের মতো সাদা উচ্চৈশ্রবা অশ্ব ও আরও সব কত কী! অবশেষে উঠলো অমৃতের পাত্রটিও। এমন সময় হঠাৎ একদিন বিনতার সাথে সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসে ঘোড়াটিকে দেখামাত্রই কদ্রুর মাথায় চাপলো এক অদ্ভুত ফন্দি। আচ্ছা বলতো, ঘোড়ার লেজটি সাদা না কালো? সাদাকে আর কালো বলবে কে? তবুও কিন্তু দুজনের মধ্যে বাজি হল- সাদা হলে কদ্রুকে, আর কালো হলে বিনতাকে পঞ্চাশ বছর ধরে করতে হবে এ-ওর দাসীবৃত্তি। কিন্তু সাদা লেজটিকে কি করে রাতারাতি কালো করে ফেলা যায়! কেন? এক হাজার কালো কুচ কুচে সাপের যে মা, তার আবার ভাবনা কিসের? মায়ের আদেশে সাপেরা দেখতে দেখতে তাদের শরীর দিয়ে ঘোড়ার লেজটিকে ঢেকে ফেলে, সাদাকে মিসমিসে কালো করে ফেলল! যারা অবাধ্য হল, রেগে গিয়ে অভিশাপ দিল তাদের কদ্রু - রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরবার। চমৎকার! এইভাবেই সেই সৃষ্টির আদিতেই, যে রক্ষক তাকেই আবার দেখা যায় ভক্ষক হয়ে দাঁড়াতে! এছাড়াও, এ থেকেই এদিন অন্যের অলক্ষ্যে সূত্রপাত হয়েছিল জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের, এবং তা থেকে মধ্যযুগে এসে বাসুকি-ভগিনী জরৎকারুপত্নী আস্তিকজননী মনসাদেবীর পূজার্চনারও।

DO NOT COPY

(৩)

এরপর, সতীন কদ্রুর চালাকিতে সহজ সরল বিনতাকে হতেই হয়েছিল তার দাসী। স্বামী নিরুদ্দেশ। সম্বলের মধ্যে তো বাকী ঐ একটি ডিম্ব! কাজেই, বড়ই কষ্টে কাটতে থাকে বেচারী বিনতার দিনগুলো। কিন্তু চিরদিন কারও সমান যায় না! তাই দেখা যায়, হঠাৎ একদিন ডিমটিকে ভেঙ্গে ফেলে তা থেকে বেরিয়ে এল মহাবলবান একটি দীপ্তিমান বিহঙ্গম। দুখিনী মাকে আশ্বাস দিয়ে, দশদিক আলোয় আলো করে, গভীর গর্জন করতে করতে এরপর পাখিটি উড়ে গেল আকাশের দিকে। তার তেজবীর্য ও তর্জন গর্জনে দেবতারা তো ভয়ে অস্থির! কে এই মহাবল? ইনি স্বয়ং অগ্নি বা তার থেকেও শক্তিমান আর কেউ? যিনিই হোন, তাকে খুশি করতে সকলে মিলে স্তব স্তুতি শুরু করে দিলেন - 'হে মহাভাগ পতঙ্গেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি সূর্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা-ইন্দ্র-জগৎপতি, তুমি সুখ দুঃখ ধাতা বিধাতা। তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত - স্থির অস্থির সমস্ত পদার্থ - চরাচর স্বরূপ ... ও এমনি এমনি আর সব কত কি বলে! [কেবল এখানেই নয়, মহাভারতের অন্যত্রও এইভাবের যে সব স্তব স্তুতি শুনতে পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, পুরাণের সকল বৈচিত্র বা বিভিন্নতাকে ছাপিয়ে, ঈশ্বরের একত্বসূচক ঋগ্‌বেদের যে মহাবাণী- 'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি' - তাইই যেন এসবের ভিতর দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে!] যাহোক, এইভাবে দেবলোক কাঁপিয়ে তুলে অবশেষে ফিরে এল আবার বাচ্চাটি মায়ের কাছে। এবারের সমস্যা - কি করে মায়ের দাসীত্ব মোচন হয় - কি করে তাঁকে সত্যের বন্ধন থেকে মুক্ত করা যায়! [লক্ষ্য করার কথা - সত্যের বন্ধনই যে মানুষের বড় বন্ধন আমাদের শাস্ত্র পুরাণে অন্য যা কিছুর চেয়ে এটাই বোধ হয় বড় কথা!] সুযোগ বুঝে কদ্রুর সাপ সন্তানেরা বায়না ধরে বসল গরুড়ের কাছে— দেবতাদের পরাজিত করে সমুদ্র থেকে সদ্য-ওঠা অমৃতের পাত্রটি যদি কোনরকমে এনে দিতে পার, তবেই তোমার মায়ের মুক্তি! একেবারেই একটা অসাধ্য ব্যাপার! তবুও মায়ের জন্য চেষ্টা করে তো দেখতে হবে ! মাকে প্রণাম করে ছুটলো এবারে মাতৃভক্ত গরুড় অমৃতের খোঁজে-অসাধ্য সাধনে! কিন্তু পথে যেতে খিদে পেলে, খাবে

কি? কেন? ঐ যে দেখা যাচ্ছে নিষাদপল্লী, ওখানকার সব নিষাদদের তো খেয়ে ফেলতে পারে ! [প্রশ্ন উঠতে পারে - ওদের অপরাধ? অপরাধ আর কি - ওরা যে অনার্য! এটাই যে ছিল ওদের বড় অপরাধ আর্যদের কাছে, তার আরও প্রমাণ রয়েছে খাণ্ডবদহনে, একলব্যের অঙ্গুলি কর্তনে, শম্বুকের মস্তকছেদনে ও আর আরও অনেক ব্যাপারেই।] তাই হল। কিন্তু নিষাদদের খেতে গিয়ে, সেইসাথে একটি ব্রাহ্মণ ও তাঁর নিষাদপত্নীকেও গিলে ফেলল গরুড়। সর্বনাশ! ব্রাহ্মণ অবধ্য। আর তাঁর সংস্পর্শে এসে, তাঁর নিষাদপত্নীটিও হয়ে পড়েছে তথৈবচ! কাজেই তাঁদের দুজনকেই একসঙ্গে উগরে ফেলতে হল গরুড়কে। [আবার কথা এসে পড়ে-একালে বা অন্য অনেক কালেও, যে অনুলোম অর্থাৎ উঁচুবর্ণের পুরুষের সাথে নীচু বর্ণের স্ত্রীর বিয়ে, তাতে কোনই দোষ ছিল না। অন্যপক্ষে, প্রতিলোম বা এর উল্টোটা কিন্তু ছিল এক অমার্জনীয় অপরাধ। এর মূলে যে যুক্তিই থাকুক না কেন, একথাটা বোধহয় কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না যে, যাদের হাতে যখন ক্ষমতা, সুখ সুবিধের পাল্লাটা তাদের দিকেই একটু বেশী করে ঝুঁকে পড়ে।] সে যাহোক, এত খেয়েও কিন্তু খিদে মিটলো না গরুড়ের। কিইবা এখন আর করা যায়! হঠাৎ দেখা গেল - পিতা কশ্যপ এসে হাজির, আর সেইসাথে চোখে পড়ে গেল - প্রকাণ্ড একটা সরোবর ও তার মধ্যে যুদ্ধরত দুই বিরাট গজকচ্ছপ। শোনা গেল ঋষি কশ্যপের মুখে - আগের জন্মে এরা ছিল দুই ভাই - একজন 'মহর্ষি', অন্যে 'মহাতপা'! তারপর বিষয় সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে পরস্পরের অভিশাপের ফলে, একজন হয়ে পড়েছে 'গজ' আর অন্যজন 'কচ্ছপ'। কিন্তু এততেও আক্রোশ না মেটায়, জন্মান্তরেও চলেছে তাদের অবিরাম যুদ্ধ। কশ্যপের আদেশে গজকচ্ছপকে নখে তুলে নিয়ে বিরাট এক পাহাড়ের চূড়োয় বসে তাদের খেয়ে শেষ করে ফেলল গরুড়; তারপর আবার বীরবিক্রমে উড়ে চলতে শুরু করল অমৃতের সন্ধানে।

(৪)

গরুড় এসে পৌঁছতেই, স্বর্গে নানা উৎপাত দেখা দিল। ইন্দ্রের বজ্র আপনা থেকেই জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল। অন্য দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্রও যে যার বলবিক্রম প্রকাশে

সোচ্চার হয়ে উঠল। হাজার হাজার উল্কাপাত ও সেইসাথে মেঘ থেকে রক্তবর্ষণ শুরু হল। ধুলোয় ধুলোয় ছেয়ে গেল আকাশ বাতাস। দেবতাদের বলবীর্য পর্যন্তও ক্রমে হ্রাস হয়ে পড়তে লাগল। কী ব্যাপার! কই, দেবাসুরের যুদ্ধের সময়েও তো এমনটি ঘটতে দেখা যায়নি। দেবরাজ ইন্দ্রের কাকুতি মিনতিতে অবশেষে জানালেন তাঁকে গুরু বৃহস্পতি, কামরূপী মহাবল বিনতানন্দন গরুড়ের অমৃতলাভের আশায় স্বর্গাভিযানের ব্যাপারটা। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল - সাজ সাজ রব উঠল! কিন্তু কি হবে তাতে? অহংকারী ইন্দ্রের দর্পখর্ব করতে বালখিল্যাদি ঋষিদের প্রভাবে দ্বিতীয় ইন্দ্ররূপে যাঁর জন্ম, সেই গরুড়ের সাথে পেরে ওঠা কার সাধ্য ? দেখতে না দেখতে সকলকে মেরে ধরে গরুড় এসে পৌঁছে গেল অমৃতভাণ্ডটির কাছাকাছি। কিন্তু একী ! পাত্রটিকে ঘিরে জ্বলছে পর্বতপ্রমাণ আগুনের শিখা! যাহোক কোনরকমে আগুনটাকে নিভিয়ে ফেলতে, দেখা দিল আর এক নতুন বিপদ। ক্ষুরধার একটা বিশাল চাকা আপনবেগে চালিত হয়ে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করে চলেছে অমৃতের আধারটিকে। নিজের বিরাট দেহটাকে সঙ্কুচিত করে কামরূপী গরুড় চক্রের ছিদ্রপথে এ বাধাটিকেও অতিক্রম করে যেতে, সামনে এসে দাঁড়াল দুটি ভীষণ দর্শন সাপ যাদের মুখে আগুনের হলকা আর চোখে তীব্র বিষের জ্বালা! বিষ ও অমৃত রয়েছে একেবারে পাশাপাশি। তাই মরণপণ করেই করতে হয় অমৃতের সাধনা - অমৃতলাভ! কিন্তু তা বলে - 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?' 'যখন যেমন, যেখানে যেমন'- একথাগুলোও তো আর মিথ্যে নয়। তাই দেখা যায় এরপর ভক্ত গরুড়কে অনর্থক নিজের বলবিক্রম প্রকাশ না করে, ধুলোয় ধুলোয় কৌশলে সাপ দুটির চোখমুখ আচ্ছন্ন করে দিতে, ও তারপর এক ফাঁকে ছোঁ মেরে অমৃতের পাত্রটি ঠোঁটে নিয়ে সোজা আকাশ পথে পাড়ি জমাতে। আশ্চর্য কথা! কিন্তু এ' থেকেও বেশী আশ্চর্য - এইভাবে দুস্তর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, মায়ার সকল প্রতিকূল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে, দারুণ বিষের জ্বালা উপেক্ষা করে, লাভ করা হল যে অমৃত - যার জন্য চলেছে নিত্যকাল ধরে দেবদানবে যুদ্ধ - সেই অমৃতে কিনা গরুড়ের 'অরুচি'! মায়ের মুক্তির জন্যই এসেছে সে অমৃত-আহরণে, নিজের ভোগের জন্য নয় ! একই মায়ের

পেটের দুটি সন্তান - একটি অভিশাপের, অন্যটি বরাভয়ের প্রতিমূর্তি!

(৫)

মুহূর্তমাত্রও দেরী না করে, স্বর্গ থেকে অমৃত নিয়ে উড়ে চলেছে গরুড় মর্ত্যধামে মায়ের উদ্দেশ্যে। পথে হঠাৎ অন্তর্যামী নারায়ণের সাথে দেখা। গরুড়ের কাজকর্মে খুশি হয়ে, আপনা থেকেই বর দিতে চাইলেন তাকে নারায়ণ। কিন্তু অমৃতকে যে উপেক্ষা করতে পারে, কোন্ বর সে আর চাইবে? তবুও নারায়ণের কথায় বর চাইল গরুড় - যেন অমৃত না খেয়েও সে অমর হতে পারে, আর তাছাড়া তার স্থান সর্বক্ষণই যেন নারায়ণের উপরেই থাকে! তথাস্তু! এরপর স্বয়ং নারায়ণকেই বলল গরুড় তার কাছে বর চাইতে। এমনি করেই একদিন বর দেওয়া নেওয়া হয়েছিল মধুকৈটভ ও দৈত্যরাজ বলির সাথেও, যার ফলে মদমত্ত মধুকৈটভ নিহত হয়েছিল বিষ্ণুর হাতে আর দানমত্ত বলিকে করতে হয়েছিল পাতাল প্রবেশ। এবারে ভক্ত গরুড়ের বেলায় কিন্তু ব্যবস্থা হল অন্যরকমের। এক বরে স্থান পেল গরুড় বিষ্ণুর রথের ধ্বজায়; অন্য বরে হতে হল তাকে বিষ্ণুর বাহন। ফলে, ভক্ত ভগবানের মধ্যে কে যে উঁচুতে, আর কে নীচুতে, তা বুঝে ওঠা হয়ে দাঁড়াল নিতান্তই দুঃসাধ্য! তাছাড়া, গরুড়ের মতো ভক্ত তো অমৃতপান না করেও তিনযুগেই অমর !

এরপর ঘটেছিল গরুড়ের সাথে দেবরাজ ইন্দ্রের যুদ্ধ ও তারপর বন্ধুত্বও। ঠিক হল - ইন্দ্রই থেকে যাবেন দেবতাদের রাজা, আর গরুড় হবেন পক্ষিরাজ। ইন্দ্রের বরে লাভ করলেন গরুড় সাপ খেয়ে হজম করার ক্ষমতা। অন্যদিকে সক্ষম হয়েছিলেন ইন্দ্র জননী বিনতার মুক্তিলাভের পরে নাগগণকে ফাঁকি দিয়ে বিনাবাধায় স্বর্গের অমৃত আবার স্বর্গে ফিরিয়ে আনতে।

এইভাবেই এখানে শেষ করা গেল গরুড়ের জন্মবৃত্তান্তটি যার ফলশ্রুতির কথায় বলতে শোনা যায় মহাভারতে - যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের মুখে খগরাজ গরুড়ের এই বৃত্তান্তটি শুনবে বা তাঁদের পাঠ করে শোনাবে, সর্বপাপশূন্য হয়ে সে নিশ্চিতই স্বর্গলাভ করবে।

যেথা শিবের আলয় নর্মদাতীরে **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য**

ভোপাল থেকে উজ্জয়িনী আবার সেখান থেকে ইন্দোর দেখে নেওয়ার পর আইটিনেরারি তে পরের দুদিন বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ওঙ্কারেশ্বর, মহেশ্বর আর মাণ্ডুর জন্য। ফিরতি ট্রেন শিপ্রা এক্সপ্রেস(২২৯১১) যেহেতু এই ইন্দোর থেকেই, তাই গৌরীশঙ্কর (৯১০৯২৪৯৮৬১) যখন ছ'হাজার টাকায় দু'দিনে তার সুইফ্ট ডিজায়ারে সব দেখিয়ে আবার ইন্দোরে ছেড়ে দেওয়ার কড়ারে রাজি হয়ে গেল তখন আর বেরিয়ে পড়তে বাধা কোথায়? গতকালটা কেটে ছিল ইন্দোর স্টেশনের লাগোয়া কসমোপলিটন হোটেলে। বেশিরভাগ মালপত্র তাদের লকারে রেখে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট শেষ হতে না হতেই যখন গৌরীশঙ্করের ভেঁপু বাজল তখনও ঘড়ির কাটা ন'টা ছোঁয়নি। তারপর ঘন্টাখানেক চলতে না চলতেই 'শনি নবগ্রহ' মন্দির। খান্ডোয়া রোডে বাইগ্রামের এই মন্দিরে সকাল দশটায় ভক্ত বলতে আমরা চারজন। প্রসঙ্গত আমার আর বুবুনের সঙ্গে এবার ভ্রমণ সঙ্গী বন্ধু ডাক্তার পার্থসারথি আর ওর স্ত্রী ঠাকুর পরিবারের স্থিরা। শনিদেবের অর্চনায় সর্ষের তেল চড়ানো এক স্বাভাবিক প্রথা। শিশি ভর্তি তেল বিক্রীও হচ্ছে মন্দিরের অন্দরে। চারজনে যতক্ষণ কষ্টি পাথরের ঠাকুরের তৈলচর্চিত করছি ড্রাইভার ততক্ষণে নাস্তা সেরে নিয়েছে, অতএব ছোটাও গাড়ি। বেদম দৌড়েও গাড়ি যখন ওঙ্কারেশ্বরের নর্মদা ব্রিজের মুখে তখন বেলা প্রায় বারোটা। ব্রিজে নর্মদা পেরিয়ে যেমন ওঙ্কারেশ্বর মন্দির যাওয়া যায় তেমনই চাইলে ফেরিতেও পার হতে পারেন নর্মদা নদী। ফেরির দালালদের ডাকাডাকি থাকলেও তাকে উপেক্ষা করি কারণ সে ক্ষেত্রে সিঁড়ি ভাঙ্গার ধকল সহ চলতে হবে অনেক বেশি। তার চেয়ে পায়ে পায়ে ব্রিজ পার হওয়ার সময় দেখি নর্মদা ও কাবেরীর মিলনে সৃষ্ট অসাধারণ ওঁ রূপী দু'বর্গ কিলোমিটারের এই ওঙ্কারেশ্বর দ্বীপ। পূব থেকে পশ্চিমে রুক্ষ পাথরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে নর্মদা, চারিপাশে মন্দিরময় বিন্ধ্যপর্বত। সামান্য পথ এগিয়ে চলতেই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম স্বয়ম্ভু দেবতা শিব তথা ওঙ্কারেশ্বর মহাদেব। সফ্ট স্টোনের এই কারুকার্যময় মন্দির নাকি গড়েছিলেন পিতৃগর্ভজাত সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতা। তাই

শ্রীওঙ্কার মান্ধাতা ও বলে লোকে ওঙ্কারেশ্বরকে। প্রথমে গণেশ মন্দির তারপর শ্বেতপাথরের নন্দী মন্দির পেরিয়ে ওঁঙ্কারেশ্বরের প্রবেশদ্বার। ১০১ স্তম্ভের উপর তৈরী মন্দিরের প্রথম তলাতেই রয়েছেন ওঁঙ্কারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ, দ্বিতলে মহাকালেশ্বর, ত্রিতলে সিদ্ধনাথ আর চতুর্থ ও পঞ্চমতলে যথাক্রমে গুপ্তেশ্বর ও দ্বিজেশ্বর। ১২.২০ থেকে ১.১৫ পর্যন্ত মন্দিরের দ্বার বন্ধ তাই ৫০০টাকার টিকিট কেটে যারা ভি আই পি লাইনে সামিল হয়েছেন, এই একটি ঘণ্টা কিন্তু তারাও নিশ্চল সাধারণ ভক্তদের মতই। ১.১৫ বাজলে অচল লাইন যখন সচল হল, ভি আই পি লাইনটা আমাদের একটু আগেই এগিয়ে গেল বটে কিন্তু শেষ পর্যায়ে যখন ওঙ্কারেশ্বর দর্শন তখন তো মুড়ি মুড়কির একদর। নিতান্ত অব্যবস্থায় প্রবল ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে সকলেই প্রায় চিড়ে চ্যাপ্টা। প্রচন্ড গুঁতোগুঁতির মধ্যে মুহূর্তের দর্শনে কি দেখলাম বুঝে ওঠার আগেই বেরিয়ে আসতে হয় মন্দির রক্ষীদের প্রায় ঘাড় ধাক্কায়। তবু দর্শন সম্পূর্ণ হয়না, যেতে হয় নর্মদার দক্ষিণ পারে বীরখোলা পাহাড়ে দেবতা মমলেশ্বর দেখতে। আসলে ১১ শতকে গজনির সুলতান মামুদের হাতে ওঙ্কারেশ্বর মন্দির ধ্বংস আর মোগলকালে অরণ্যে লুকিয়ে রাখা দেবতা হারিয়ে গেলে ১৮ শতকে আজকের মমলেশ্বর মন্দির গড়েন পুণের পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও। পরবর্তীকালে ওঙ্কারেশ্বরকে খুঁজে পাওয়া গেলে দুই দেবতাই পূজিত হয়ে চলেছেন নর্মদার উত্তর - দক্ষিণ দুই পারেই। তবু বলতেই হবে ওঙ্কারেশ্বরের মত প্রচার মমলেশ্বর পায়নি। না হলে প্রায় তিন ঘন্টা অপেক্ষার পরও যে দেবতাকে মুহূর্তকালের বেশি চোখে দেখিনি তাকেই আশ মিটিয়ে নর্মদার দক্ষিণ পাড়ে দেখলাম মাত্র পনের মিনিটে! ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেরিয়ে বুঝেছি ধর্মের জন্য ভক্তের দল করতে পারেনা এমন কাজ নেই। এমনিতে যাদের মুহূর্তের বিলম্ব সয় না, দেবস্থানে তা সে কেদার, তিরুপতি, কামাখ্যা অথবা ওঙ্কারেশ্বর যেখানেই হোক, ঘণ্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে পারে হাসিমুখে। অথচ ওঙ্কারেশ্বর শুধুই মন্দিরময় নয়, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই বা কম কি সে? পাথরের বুকে নর্মদার বুকে চলার ছন্দ তো আগেই বলেছি, কাবেরীর সাথে তার মিলনও কম মধুর নয়। পুণ্যার্থীরা চাইলে চলতে পারেন

১১ কিলোমিটার পরিক্রমায়। নানান হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরের মধ্যে রয়েছে বীরখোলা পাহাড়ে গৌরী-সোমনাথ আর নর্মদার উত্তরে বহু সাধকের সিদ্ধস্থল সিদ্ধকূট। রয়েছে আদি শঙ্করাচার্য যেখানে তার গুরু গোবিন্দ ভগবদপাদের দেখা পান আজকের সেই 'একাত্ম ধাম'। নর্মদার পাড়ের এই ধামে ১০৮ ফুট উচ্চতার শঙ্করাচার্যের মূর্তির উদ্বোধন হয়েছে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে। একাত্ম ধাম অবশ্যই 'ইউনিটি এন্ড ওয়াননেসের' বাতিঘর; কিন্তু গোলাকারে সেজে ওঠা এই ধামের পরিবেশ আর প্রকৃতি এখানে দু'দন্ড দু'চোখ মেলে দেখারও দাবি করে। একটা কথা বলে রাখি, নর্মদাকে একটু দূর থেকে দেখাই ভাল। আকর্ষণীয় হলেও যেন তার বুকে ঝাঁপাবেন না। বডিগার্ড হিসেবে কুমির আছে। তাদের সোহাগ পরশ কিন্তু মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

ওঙ্কারেশ্বর থেকে এবার আমাদের চলতে হবে মহেশ্বরে। দূরত্ব কম বেশি ৬৮ কিলোমিটার। পথ গৌরীশঙ্করের হিসেব মতই পার হয়ে এলাম মোটামুটি পৌনে দুঘণ্টায়। রাতের আশ্রয়ের জন্য পঞ্চবটী কলোনীর হোটেল শ্রীশরনম আমাদের মাথায় ছিল বটে, কিন্তু দিনের আলো যে তখনো নিভে আসেনি! অফ সিজনে হোটেল নিয়ে তেমন মাথা ব্যথা ছিলনা তাই গৌরীশঙ্করকে বললাম নিয়ে যেতে একদম নর্মদা ঘাটের পাশটিতে। শেষ বিকেলের মহেশ্বর ঘাট যেন বেনারসের রেপ্লিকা। তেমন জমজমাট নয় ঠিকই কিন্তু ঘাটে ঘাটে মন্দির আর পথে পথে শিবলিঙ্গ এই শান্ত সমাহিত শহরকে ভক্তজনের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শুধু কি তাই? নর্মদার ঘাটটাই এমন ঝামেলাহীন সুন্দর যে সেখানে বসে সময়কে দৌড়ে পালাতে দেখলেও কিছু করার থাকে না। তবু নর্মদাকে পিছনে রেখে উঠে আসতে হয় ১৭৬৩ সালের অহল্যাবাঈ-এর রাজওয়ারায়। কাল সকালে খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না।, তাই প্রথম সুযোগেই দেখে নিই কাশী বিশ্বনাথ, রাজরাজেশ্বরী আর শ্রীরাম মন্দির। আরতির সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে মন চাইলেও ওঙ্কারেশ্বরের ভিড় বে-দম করেছিল আমাদের সকলকেই। তাই বাধ্য হয়েই ফোন করি গৌরীশঙ্করকে।

ঠিক কোথায় আছি বলে দিতেই সে আমাদের নিয়ে এল রাতের আশ্রয় শ্রীশরণম হোটেলে।

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গা চোখে ১০১ নম্বর ঘরের বাইরে এসে খোলাছাদে দাঁড়াতেই দিলখুশ! সূর্য তখন মহেশ্বরের ঘুম ভাঙ্গাচ্ছে। ১০৮ নম্বরে বেল টিপতে সে দৃশ্য দেখল স্থিরা-পার্থও। তারপর ব্যাগপত্তর গুছিয়ে সে সমস্ত হোটেলেই রেখে চলি রাজমাতা অহল্যাবাই এর কেল্লা। রামায়ণ-মহাভারতের মহিষ্মতী এই মহেশ্বরকে হোলকার কুইন নতুন করে গড়েছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ইন্দোর রাজ্যের পূর্বতন রাজধানীর এই কেল্লায় গতকাল এসেছিলাম নর্মদার ঘাট থেকে। আজ গৌরীশঙ্কর শহরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসে যেখানে গাড়ি থামাল সেটাই কেল্লার সদর দরওয়াজা। ঢুকতেই রাণী অহল্যার মূর্তি আর বিপরীতে ঘেরা স্থানে তার রাজ্যপাট চালাবার রাজগদ্দি। এখানেও রাণীর মূর্তি রয়েছে, সঙ্গে পুত্র মালেরাও। ঐ ঘেরা প্রাঙ্গণেই রয়েছে হোলকারদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং পবিত্র এক নীরবতা যা বলে দিচ্ছে রাজমাতার প্রতি এখনও মহেশ্বরবাসীর কতটা ভক্তি। ফটো তোলারও অনুমতি নেই মন্দিরসম রক্ষা করা এক টুকরো অহল্যা ভূমিতে। রাজওয়ার দক্ষিণে রাণীর পূজাস্থল। মহেশ্বর শিব ছাড়াও সেখানে অধিষ্ঠিত নানান দেবতা। রয়েছে 'স্বর্ণঝুলাক' বালমুকুন্দ, তবে নবরত্ন মহাদেব মূর্তি এখন আর এখানে নেই। স্থানান্তরিত হয়েছে ইন্দোরের প্রাসাদ মিউজিয়ামে।

নর্মদার পলি থেকে প্রতিদিনের মত আজও ১১,০০০ শিব গড়া হচ্ছে স্বর্ণঝুলার পাশের ঘরে। সদ্য গড়া সেই শিব পূজিত হওয়ার পর নর্মদার জলে বিসর্জিত হয়ে যাবে দুপুর বারোটায়। এ প্রথা আজকের নয়। রাণীর আমলেপ্রজাদের মঙ্গল কামনায় প্রতিদিন গড়া হত ১২৫,০০০ শিব। তারপর সারাদিন পুজো পাওয়ার পর সেই পলিমাটির শিব সন্ধ্যায় আবার মিলিয়ে যেত নর্মদার জলে। তাইতো মহেশ্বরবাসীর কাছে আজও 'হর কঙ্কর হ্যায় শঙ্কর'। নর্মদার ঘাট আজও সে সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

DO NOT COPY

মহেশ্বরের আরেক আকর্ষণ মহেশ্বরী শাড়ি। সিল্ক ও কটনে মিশ্রিত এঈ শাড়ির নমুনা দেখতে রাণীর প্রতিষ্ঠিত REWA SOCIETY তে অবশ্যই উঁকি দেবেন। আসলে সে যুগের নারীদের শিক্ষা ও কর্মস্থাপনের মাধ্যমে আত্মনির্ভর করে তোলার নানান কর্মযজ্ঞের অন্যতম ফসল এই মহেশ্বরী শাড়ি। সঙ্গের দুই নারীর হাতে তরবারি না থাক মানি পার্সতো আছে, তাই শ্রীশরণমের বিলপত্তর মেটাবার পরও মহেশ্বরে আরো কিছু সময় কাটাতে হয় সরকারি এম্পোরিয়ামে বুবুন-স্থিরার কাপড় বাছাইয়ে উৎসাহ দিতে। সে পর্ব কতক্ষণ চলত জানিনা, কিন্তু মাণ্ডবগড়ের সব দরজাই বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায় জেনে গাড়িকে এবার ওড়াতেই হয়। বেশি তো নয় মাত্রই চল্লিশ কিলোমিটার! তারপরেই তো মাণ্ডু, যেখানকার পাথরে শুধুই প্রেমের কবিতা।

রাণী অহল্যাবাই

রাণী অহল্যার প্রাসাদ

DO NOT COPY

১১,০০০ শিবলিঙ্গ নির্মাণ

অহল্যা গৃহের প্রবেশ পথ

ওঁকারেশ্বরের নর্মদা

মামলেশ্বর মন্দির

DRAFT

অপ্রাকৃত

শ্রী সুনন্দন ঘোষ

তুমি বলেছিলে - একবার ঘুরে যাও আমার বাড়ি।
এলাম।
সকাল থেকে খুঁজে ফিরেছি তোমায়।
যাকেই শুধোই, আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয় –
'উ—ই হোথা ---'

বর্ষায় ছোট ছোট পাহাড়ের কোল ছুঁইয়ে ছুটে চলা জয়ন্তী,
দূরে মেঘের কোলে লুকোচুরি খেলা ভুটান ঘাট,
ঘুমন্ত বুদ্ধের কোলে দিনে দিনে বেড়ে ওঠা ধোত্রে,
চৈত্রের পলাশে পাগল করা সিরকাবাদ,
ভোরের সূর্যে রাঙা সজনেখালি,
উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূব থেকে পশ্চিম
তোমার আঙিনা।

বেলা পড়ে এসেছে।
এবার ফেরার পালা।
ফেরার টিকিট কেটেই নামতে হয় তোমার স্টেশনে।

দিনশেষে ক্লান্ত আমি গোধূলি আলোয়
তোমায় খুঁজে পেলাম বুকের মাঝে
ডানা ঝাপটানো সিঁদূরে হলুদ এক ছোট্ট মৌটুসী পাখী।

DO NOT COPY